ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণাঃ

''হতাশ হয়োনা এবং দুঃখ করো না। তোমরাই জয়ী হবে, যদি তোমরা মু'মিন হও।''- আল-ইমরানঃ ১৩৯

উপরের আয়াত পাঠে প্রথমে যে ধারণার সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে, সশস্ত্র জিহাদের বেলায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের নিশ্চয়তা দান। কিন্তু আয়াতের অন্তর্নিহিত ভাবধারা, মূল্যবোধ, ঘটনাবলীর বিচার বিশ্লেষণ ও হিসেব-নিকেশের পদ্ধতি থেকেই তার সদা জাগ্রত বিবেকের পরিচয় ফুটে উঠে। তার মন সকল অবস্থায়, সকল পরিবেশে ও সকল বিষয়েই ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব বহাল রেখে চলবে। যত ঘটনা ও বিষয়াবলীর সম্মুখীন হবে, সবগুলোতেই সে ঈমানের দৃষ্টিতে যাচাই করে কর্মপন্থা নিরুপণ করবে। ঈমানের উৎস বাদ দিয়ে দুনিয়ায় গ্রহণ-বর্জনের যেসব মূল্যবোধ প্রচলিত আছে সেগুলোকে বিনা দ্বিধায় বাতিল করে দিয়ে ঈমানের প্রাধান্য দান করবে। অনুরূপভাবে যেসব পার্থিব শক্তি ঈমানের বলে বলীয়ান নয়, মু'মিনের দৃষ্টিতে তার কোনই গুরুত্ব নেই। যেসব রীতিনীতি, আইন-কানুন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবন বিধান ঈমানের সম্পদ থেকে বঞ্চিত সেগুলোকে নিঃসংকোচে পরিত্যাগ করে ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই হবে মু'মিনের দায়িত্ব।

ঈমানী শক্তিই মু'মিনের আসল সম্পদ ও মূল শক্তি। দুর্দান্ত ক্ষমতাশালী শাসকের সামনেও ঈমানী শক্তি নতি স্বীকার করে না। কোন সামাজিক রীতিনীতি ও বাতিল আইন-কানুনের সামনেও ঈমান মাথা নত করে না। ঈমানের আলো থেকে বঞ্চিত শাসন ব্যবস্থা যত জনপ্রিয়তাই অর্জন করুক না কেন; মু'মিন কখনো এ ঈমান বিহীন ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারে না। এক কথায় মু'মিনের জীবন বেঈমানীর বিরুদ্ধে এক স্থায়ী ও সর্বাত্মক জিহাদেরই জ্বলন্ত নমুনা। সশস্ত্র যুদ্ধে দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে শত্রুর মুকাবিলা করা ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠারই বাস্তব পদক্ষেপ মাত্র। মু'মিন পার্থিব উপকরণের বিবেচনায় দুর্বল হোক অথবা সবল, তাদের সংখ্যা কম হোক অথবা বেশী, তারা দরিদ্র হোক অথবা ধনী, সকল অবস্থাতেই ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব বহাল রেখে চলবে।

ঈমানের প্রভাবে সৃষ্ট মনোবল, সাময়িক ভাবপ্রবণতা বা ক্ষণস্থায়ী অগ্নিস্ফুলিংগ নয়। মহাসত্যের অনুভূতি ও এ সত্যের প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিনের অন্তরে এক স্থায়ী শ্রেষ্ঠত্ববোধের জন্ম দেয়। এ সত্যানুভূতি প্রচলিত যুক্তি-তর্ক, পরিবেশের চাপ, সামাজিক অভ্যাস ও পুরুষানুক্রমিক রীতিনীতির তুলনায় অনেক বেশী মযবুত ও স্থায়িত্বের অধিকারী, কারণ চিরঞ্জীব আল্লাহর প্রতি ঈমান মু'মিনের অন্তরে চিরস্থায়ী শক্তির জন্মদান করে।
সমাজে বিশেষ কতক চিন্তাধারা ও মতবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সামাজিক বন্ধন ও কঠোর আইন-শৃংখলা প্রতিটি ব্যক্তিকে প্রচলিত চিন্তাধারা ও মতবাদ মেনে চলতে বাধ্য করে। সমাজের কোন শক্তিমান মহলের আশ্রয় বা বাইরের কোন শক্তির সাহায্য ব্যতীত কারো পক্ষে প্রতিষ্ঠিত মতবাদ ও চিন্তাধারার বিরুদ্ধাচারণ সম্ভব নয়। অপর দিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত মতবাদের প্রবল প্রভাব বিরাজমান থাকে। একটি উন্নততর মতবাদ ও চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হবার পরই মানুষ পূর্বের মতবাদ ও চিন্তা ধারার অসারতা উপলব্ধি করে তা বর্জন করতে প্রসত্মুত হয়। অন্যথায় প্রচলিত মতবাদ ও চিন্তাধারার প্রভাব থেকে নিস্তার নেই। প্রচলিত মতবাদ ও চিন্তাধারা যেসব শক্তির সহায়তায় সমাজে টিকে রয়েছে, সেসব শক্তির তুলনায় অধিক পরাক্রান্ত বৃহত্তর এবং উন্নততর শক্তির সহায়তা ছাড়াও প্রতিষ্ঠিত মতবাদের প্রভাব থেকে মুক্তি হাসিল করা সম্ভব নয়।

যে ব্যক্তি সমাজের প্রবহমন গতিধারার বিপক্ষে উঁচু করে দাঁড়ায়, শাসক শক্তির সমর্থন পুষ্ট দৃষ্টিভংগীর বিরোধিতা করে, প্রচলিত রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, চিন্তাধারা ও মতবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অনিষ্টকারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তার জন্যে

মানুষের চেয়ে অধিক পরাক্রান্ত পর্বতের চেয়েও অধিকতর মযবুত ও জীবনের চেয়েও অধিকতর প্রিয় কোন না কোন অবলম্বনের প্রয়োজন হবে। অন্যথায় ঐ সমাজে সে শুধু নিজের অসহায়ত্বই উপলদ্ধি করবে না বরং বিশাল দুনিয়ায় সে আশ্রয় নেয়ার মত সামান্য ঠাঁই খুঁজে পাবে না। এমতাবস্থায় রহমানুর রাহীম মু'মিনকে অত্যাচারী সমাজের বুকে দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের মুকাবিলা করার জন্যে একাকী ছেড়ে দিতে পারেন না। তাই তিনি মু'মিনদের লক্ষ্য করে এ আশ্বাসবাণী নাযিল করেছেন-

''যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তাদের তুমি কখনো আল্লাহর শত্রুদের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে দেখবে না। হোক না তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও নিকট আত্মীয়।'' - মুজাদালাঃ ২২

প্রতিকূল পরিবেশের অন্তহীন অত্যাচারে মানুষের উৎসাহে ভাটা পড়া এবং সাহস শিথিল হয়ে আসা স্বাভাবিক। ঠিক সে মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার এ আশ্বাসবাণী মু'মিনের অন্তরে শক্তি ও প্রেরণার সঞ্চার করে। নিছক ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাহায্যে নয় মু'মিন এক শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও মহান লক্ষ্যের দিকে খেয়াল রেখেই সকল প্রতিকূলতার উপর বিজয়ী হয়। ঈমান ও চিন্তার ক্ষেত্রে মু'মিন এত উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায় যে, সেখান থেকে দুনিয়ায় সকল তাগুতী শক্তি, পরাক্রান্ত শাসক, শাসন ক্ষমতার সাহায্য পুষ্ট চিন্তাধারা, আইন-কানুন ও রীতিনীতি সব কিছুই অত্যন্ত হেয় ও তুচ্ছ বিবেচিত হয়।

মু'মিন প্রকৃত পক্ষেই শ্রেষ্ঠ। কারণ তাঁর অবলম্বন যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি শ্রেষ্ঠ তাঁর আকীদা-বিশ্বাসের উৎস। বিশাল সাম্রাজ্য তার দৃষ্টিতে নগন্য মাত্র। বিপুল শক্তির অধিকারী ব্যক্তিবর্গ তার নিকট তুচ্ছ। সমাজে প্রচলিত জনপ্রিয় মূল্যবোধ ও মানদন্ড মু'মিনের বিবেচনায় হেয় ও নীচ মনেবৃত্তি প্রসূত। বিপুল সংখ্যক মানুষকে কোন বিষয় পছন্দ করতে দেখেই মু'মিন সে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায় না। এদিক থেকে মু'মিনের স্থান সকলের শীর্ষে। সে সকল জ্ঞানের উৎস একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে পথের সন্ধান লাভ করেছে। প্রতিটি বিষয়ে সে মহান আল্লাহর নির্দেশ জানতে চায় এবং সেখান থেকে যখন যে বিষয়ে যেরূপ হেদায়াত লাভ করে, তা-ই সে মেনে চলে।

বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টি ও স্থিতিশীলতা সম্পর্কেও মু'মিনের আকীদা-বিশ্বাস সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাওহীদের যে দৃষ্টিভংগী ইসলাম তাকে শিখিয়েছে, তার বদৌলতে সে পরিপূর্ন সত্যকে সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। তাওহীদের মতবাদে বিশ্ব প্রকৃতির যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা দুনিয়ার সকল প্রাচীন ও আধুনিক মতবাদের অনেক উর্ধ্বে। শির্কভিত্তিক ধর্ম, পথভ্রষ্ট আহলে কিতাবদের আকীদা-বিশ্বাস ও ঘৃণ্য বস্তুবাদের সৃষ্ট সকল মতবাদের অসারতা, পরস্পর বিরোধিতা ও অবাস্তবতা পর্যালোচনা করে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, যারা বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণার অধিকারী, তারা নিসন্দেহে সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ।

জীবনের মূল্যবোধ এবং বিষয়-আশয়, পদার্থ ও মানুষ যাচাই-বাছাই করার মানদন্ড সম্পর্কে মু'মিন যে ধারণা পোষণ করে, তা অন্যান্যদের ধ্যান-ধারণার তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও শীর্ষ স্থানীয়। ইসলাম বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের ফলে সৃষ্ট বোধশক্তি শুধু সীমাবদ্ধ পৃথিবীরই নয়, অসীম বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যেদঘাটন করে দিয়ে মু'মিনের অন্তরে জীবনের যে মূল্যবোধ এবং গ্রহণ-বর্জনের যে মানদন্ড দান করে তা সাধারণভাবে প্রচলিত সামঞ্জস্যবিহীন ও ত্রুটিপূর্ন মানদন্ডের তুলনায় উত্তম, নিষ্কলুষ ও বাস্তব। মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাই তারা যুগে যুগে বার বার ভাল মন্দের মানদন্ড প্রচলিত করিয়ে থাকে। কোন কোন সময় দেখা গিয়েছে যে, একই ব্যক্তি কোন বিষয়ে দিনের পূর্বাহ্ণে যে অভিমত ব্যক্ত করেছে, অপরাহ্ণে ঠিক তার বিপরীত রায় প্রদান করেছে।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের ফলে বিবেক, বোধশক্তি, চরিত্র ও আচার-ব্যবহারে মু'মিন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ গুণাবলী অর্জন করে। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা উত্তম নাম ও শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারী। মু'মিনের আকীদা-বিশ্বাসই তার মনে আত্মমর্যাদাবোধ, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, শিষ্টাচার ও ভদ্রতা, ভাল কাজ করার আগ্রহ এবং পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জনের প্রেরণা সৃষ্টি করে। তাছাড়া এ আকীদা-বিশ্বাসই মু'মিনের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, আখেরাতেই কর্মফল প্রাপ্তির সঠিক স্থান এবং সেখানে নেক আমল ও পবিত্র জীবন যাপনের যে পুরস্কার পাওয়া যাবে তার তুলনায় পার্থিব জীবনের দুঃখ কষ্ট অতি নগন্য। এ ধরনের অনুভূতি সৃষ্টির ফলে মু'মিনের অন্তরে গভীর প্রশান্তি নেমে আসে। ফলে সারা জীবন পার্থিব সুখ সম্পদ থেকে বঞ্চিত থেকেও সে কোন অভিযোগ করে না।

মু'মিন যে আইন-কানুন ও জীবন বিধান মেনে চলে তা সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানব রচিত সকল আইন কানুনের বিচার বিশ্লেষণ করে মু'মিনের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে এ যাবৎ মানুষ বহু চেষ্টা সাধনা করে যা কিছু হাসিল করেছে সেগুলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও আইন-কানুনের তুলনায় নেহায়েত ছেলে খেলা ছাড়া কিছু নয়। তার মনে আরও প্রত্যয় জন্মে যে, আইন-বিধান রচনার উদ্দেশ্যে মানুষ এ যাবৎ যে পরিশ্রম করেছে, তা অন্ধ ব্যক্তির পথ চলার সাথেই তুলণীয়। তাই নিজের অবস্থান স্থল থেকে মু'মিন যখন পথ হারা মানুষের আকুলতা ব্যকুলতা ও অসহায়ত্ব দেখতে পায় তখন তার মনে তাদের জন্য সহানুভূতি সৃষ্টি হয় এবং সে নিজেকে বিভ্রান্ত মানব সমাজের উপর বিজয়ী বলে বুঝতে পারে।

জাহিলিয়াতের যুগে মানুষ অন্তরসারশূন্য ক্ষমতার দর্প এবং পার্থিব সম্পদের চাকচিক্য ও জাঁক-জমকের নেশায় বিভোর ছিল। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের বদৌলতে মু'মিন এসব বস্তু পূজার অসারতা উপলব্ধি করে উপরোল্লিখিত গুণাবলী ও চরিত্রের অধিকারী হয়। জাহিলিয়াত যুগ বিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষ যখনই ইসলামে আলোকজ্জল পথ পরিত্যাগ করবে, তখনই সে জাহিলিয়াতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যাবে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সকল কাল ও সকল যুগের জন্য একই নিয়ম। বিখ্যাত পারস্য সেনাপতি রুস্তমের জাঁক-জমক পূর্ণ শিবিরে জাহিলিয়াতে বিচিত্র রূপ দেখতে পেয়ে হযরত মুগীরা বিন শাবী (রাঃ) যে মনভাব প্রকাশ করেছিল তা আবু উসমান নাহদীর ভাষায় উল্লেখ করছিঃ

''নদীর পুল পার হয়ে মুগীরা বিন শাবী (রাঃ) পারস্য সৈন্যদের শিবিরে উপনীত হলেন। তারা তাঁকে বসিয়ে রেখে রুস্তমের নিকটে তাঁর স্বাক্ষাতের জন্যে অনুমতির আবেদন জানালো। যুদ্ধে পরাজয় বরণ করা সত্ত্বেও তারা জাঁক-জমক কিছুমাত্র হ্রাস করেনি। মুগীরা অনুমতি পেয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলেন। শিবিরের সকলেই নির্দিষ্ট পোশাক পরিহিত ছিল। তাদের কারো মাথায় সোনার তাজ ও শরীরে সোনার কারুকার্য খচিত পোশাক ছিল। শতাধিক গজ পরিমিত স্থান ভারী ও মূল্যবান কার্পেটে আবৃত ছিল। মুগীরা তাবুতে প্রবেশ করলেন। তিনি সোজা উঁচু মঞ্চের উপর উঠে রুস্তমের পাশে বসে গেলেন। দরবারী লোকজন ছুটে গিয়ে তাকে হাত ধরে সেখান থেকে নামিয়ে নিয়ে আসে। হযরত মুগীরা বলতে শুরু করলেন আমরা এ যাবৎ তোমাদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। কিমন্তু আজ দেখতে পেলাম, তোমরা একটা নির্বোধ জাতি। আমাদের সমাজে সকল মানুষই সমান- কেউ কারও দাস নয়। তবে যুদ্ধ বন্দীদের কথা স্বতন্ত্র। আমি মনে করতাম তোমরা আমাদেরই মত পরস্পরকে সমান মর্যাদা দিয়ে থাক। তোমরা আমার সাথে যে ব্যবহার করলে তার আগে আমাকে জানিয়ে দিলেই তো ভালো হত যে, তোমাদের সমাজে কিছু সংখ্যক লোক অপরদের উপর রবত্ব কায়েম করে রেখেছো। আমি তোমাদের আমন্ত্রণে এখানে এসেছি- সেচ্ছায় আসিনি। কাজেই তোমরা যে ব্যবহার করলে তা কিছুতেই সদ্ব্যব্যবহার নয়। আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমাদের সামাজিক কাঠামো অত্যন্ত দূর্বল। সুতরাং তোমাদের পরাজয় অবধারিত। এ ধরণের চরিত্র ও মনমানসিকতা নিয়ে কোন সাম্রাজ্যই টিকে থাকতে পারে না''।

কাদেসিয়ার যুদ্ধ প্রাক্কালে বারী বিন আমের (রাঃ) ও রুস্তম এবং তার সভাসদগণের সমূখে একই মনভাবের পরিচয় দান করেছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপঃ

কাদেসিয়ার যুদ্ধের পূর্বে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বারী বিন আমের (রাঃ)-কে পারস্য সম্রাটের সেনাপতি রুস্তমের দরবারে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। বারী বিন আমের (রাঃ) শিবিরে প্রবেশ করে দেখতে পান, দরবার কক্ষ মূল্যবান কার্পেটে সাজানো রয়েছে। সোনার তাজ ও মণিমুক্তা খচিত পোষাক পরিহিত রুস্তম একটি উঁচু মঞ্চের উপরে স্বর্ণ নির্মিত সিংহাসনে বসে ছিল। বারী (রাঃ) ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় হাতে একটি ছোট ঢাল ও বর্শা নিয়ে ক্ষুদ্র ঘোড়ায় চড়ে দরবারে প্রবেশ করেন। একটি মূল্যবান কোল বালিশের সাথে ঘোড়াটিকে বেঁধে তিনি রুস্তমের নিকট যেতে উদ্যত হন। তার শরীরে তখনও যুদ্ধের পোষাক ছিল। মস্তকে লৌহ শিরস্ত্রণ ছিল ও বর্ম পরিহিত অবস্থায় অগ্রসর হলে দরবারীগণ তাঁকে যুদ্ধের পোষাক খুলে ফেলতে বলল। বারী বিন আমের (রাঃ) বললেন,'' আমি নিজে সাধ করে এখানে আসিনি। তোমরা আমন্ত্রন করে নিয়ে এসেছ। যদি আমার এ পোষাক তোমাদের অপছন্দ হয় তাহলে ফিরে যাচ্ছি''। রুস্তম বললেন, তাকে আসতে দাও। তিনি তার হাতের বর্শায় ভর করে এগিয়ে গেলেন। বর্শার খোঁচায় কার্পেট খানা স্থানে স্থানে ক্ষত বিক্ষত হলো। রুস্তম প্রশ্ন করল,''তোমরা কি জন্যে এসেছ'' ? তিনি জবাবে বললেন,'' মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে উদ্ধার করে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর বন্দেগীতে নিয়োগ করার জন্য আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। যারা দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে নিজেদের মুক্ত করে আখেরাতে সীমাহীন কল্যাণ পেতে ইচ্ছুক, তাদের সে প্রশস্ত ময়দানে পৌছানো এবং মানব রচিত ধর্মের অত্যাচার থেকে রেহাই দিয়ে মানুষকে ইসলাম প্রদত্ত ন্যায়-নীতির অধিনে আনয়ন করা আমাদের লক্ষ্য''।

কালক্রমে এক বিপ্লব এসে মুসলামনের দৃষ্টিভংগীতে দূর্বলতা করে দেয় এবং তারা পার্থিব সম্পদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে যায়। তবুও তাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বহাল থাকে। তাদের অন্তরে যদি ঈমানের প্রদীপ জ্বলন্ত থাকে, তাহলে সে নিজে পরাজিত হওয়া সত্বেও বিজয়ী জাতিকে নিজের তুলনায় হেয় ও হীন বিবেচনা করবে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, পার্থিব প্রাধান্য অস্থায়ী ব্যাপার মাত্র। আজ হোক কাল হোক বিজয়ী ভ্রান্ত জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এমনকি মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে মু'মিন পার্থিব সম্পদের অভাব সত্তেও বাতিল শক্তির সম্মুখে নতজানু হবে না। মু'মিন বিশ্বাস করে যে, প্রতিপক্ষের মৃত্যু অতি তুচ্ছ ব্যাপার। কিমত্মু তার নিজের জন্য রয়েছে শাহাদাতের মর্যাদা। এ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহনের সাথে সাথেই মু'মিন জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং আজকের শক্তিশালী ও বিজয়ী দল আখিরাতে কঠোর যন্ত্রনাদায়ক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে- এ বিষয়ে সে নিশ্চত। কারণ মু'মিন নিজে ও প্রতিপক্ষের পরিনাম সম্পর্কে আল্লাহ পাকের পরিষ্কার ঘোষনা শুনতে পেয়েছে। তিনি বলেছেন,

''দেশের উপর আল্লাহদ্রোহীদের দাপট দেখে তোমরা প্রতারিত হয়ো না। এতো অল্প কয়েকদিনের জন্য সামান্য সম্পদ মাত্র। পরিনামে তারা অত্যান্ত মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অপর দিকে যারা নিজেদের রবকে ভয় করে জীবন যাপন করে তাদের জন্য রয়েছে বাগ-বাগিচাময় বাসস্থান- সেখানে প্রবাহিত রয়েছে শ্রোতস্বীনী। ঐ বাগ-বাগিচাগুলোতে তারা চিরকাল বাস করবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য মেহমানদারীর ব্যবস্থা। আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে, নেক লোকদের জন্য তাই উত্তম''। - আলে ইমরানঃ ১৯৬-১৯৮

মু'মিনের ঈমান, আকীদা, মূল্যবোধ ও মানদন্ডের বিপরীত আকীদা-বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও মানদন্ড সমাজে প্রাধান্য বিস্তার লাভ করতে পারে। তবু মু'মিনের বিবেক এক মুহূর্তের জন্যেও নিজের উচ্চ মর্যাদা ও অপর সকলের নিম্নমানের বিষয় ভুলে যেতে পারে না সে নিজের সুউচ্চ অবস্থানস্থল থেকে আত্মমর্যাদাবোধ ও সম্ভ্রম বহাল রেখে ধৈর্য ও সহানুভূতি সহকারে সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং তাদের সুপথ প্রদর্শন ও অধঃপতিত স্থান থেকে টেনে উন্নতির শীর্ষে পৌছানোর জন্যে তার অন্তরে অদম্য আকাঙ্খা জেগে উঠে।

বাতিল অদ্ভুত ধরনের হৈ চৈ সৃষ্টি করে গর্জন ও চিৎকারে চারদিকে প্রকম্পিত করে তোলে, বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়, গোঁফে তা দেয় এবং তার চারদিকে তোষামোদকারীদের এক বিরাট বাহিনী সমবেত করে অপরের চর্মচক্ষু ও অন্তর্দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে দেয়। সমাজের মানুষ দৃষ্টিশক্তি বিভ্রান্তকারী চাকচিক্যের আড়ালে লুকায়িত বাতিলের ভয়ানক চেহারার কদাকার বিভৎস রূপ দেখতে পায় না। মু'মিন সুউচ্চ আসনে বসে বাতিলের অসার তর্জন-গর্জন লক্ষ্য করে এবং বিভ্রান্ত মানুষের প্রবঞ্চিত অবস্থা দেখতে পায় কিমন্তু তার মনে কোন দুর্বলতা প্রশ্রয় পায় না- সে কোন দুঃখ অনুভব করে না এবং মহাসত্যের প্রতি তার অটল বিশ্বাস বিন্দুমাত্র শিথিল হয় না। সীরাতুল মুস্তাকিম থেকে তার পা এক চুল পরিমাণও বিচলিত হয় না। বরং তার অন্তরে বিভ্রান্ত ও প্রবঞ্চিত মানুষকে হেদায়াতের পথপ্রদর্শনের আগ্রহ ও প্রেরণা আরও প্রবল হয়ে উঠে।

জাহেলী সমাজ কামনা-বাসনায় ডুবে যায়। নীচ প্রবৃত্তি বন্যায় ভেসে যায়। সর্বত্র অশ্লীলতা ও নোংরামী সকল বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে নিরাপদে আনন্দ উপভোগ করছে। অবশেষে ঐ সমাজে পবিত্র পরিবেশ ও হালাল খাদ্য দুর্লভ হয়ে যায়- এমনকি, পাওয়াই যায় না। মু'মিন এসবের উর্ধ্বে বসে আবর্জনা ও নোংরামীর স্রোতে ভাসমান সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখে। সে একাকী হলেও সমাজের গতি প্রকৃতি দেখে হতাশ অথবা দুঃখিত হয় না। তার মনে মুহূর্তের জন্যেও পবিত্রতা ও শালীনতার অংগাবরণ দূরে নিক্ষেপ করে অশ্লীলতার প্রবহমান স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়ার ইচ্ছা জাগে না। ঈমানের স্বাদ ও আকীদার সুখানুভূতির বদৌলতে সে নিজেকে ঐ আবর্জনাময় সমাজের অনেক উর্ধে দেখতে পায়।

যে সমাজ দ্বীনের প্রতি বিদ্রোহী, যে সমাজ সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধ হারিয়ে অধঃপতিত হয়ে গেছে, যে সমাজে উচ্চ মূল্যবোধের অভাব, যে সমাজে ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের অভাব, মোটকথা যে সমাজ পবিত্রতা শালীনতার সকল গুণাবলী বর্জন করেছে, সে সমাজে একজন মু'মিন হাতের মুঠোয় জ্বলন্ত অঙ্গার খন্ড ধরে রাখার মতই দীন ও ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রাখে। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে যারা অভস্ত, তারা মু'মিনের দৃঢ়তা দেখে ঠাট্টা-বিদ্রুপকারী ও সমালোচকদের দিকে তাকায় এবং তার মুখ থেকে হযরত নূহ (আঃ)-এর উচ্চরিত শব্দগুলোই বের হয়ে আসে। কন্টকাকীর্ণ দীর্ঘ পথ অতিক্রম কালে ঠাট্টা-বিদ্রুপকারী জনতাকে লক্ষ্য করে ধৈর্য ও দৃঢ়তার মূর্ত প্রতীক হযরত নূহ (আঃ) বলেছেন-

''আজ তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্রুপ করছ। একদিন আমরাও তোমাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করবো, যেভাবে এখন আমাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করছ।'' -হুদঃ ৩৮

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণীর আলোকে মু'মিন নিজের ও বিরোধী মহলের উভয় পক্ষের পরিণাম সুস্পষ্টরূপে দেখতে পায়। আল্লাহ পাক বলেছেন-

''অবশ্যই অপরাধী ব্যক্তিরা (দুনিয়াতে) ঈমানদারদের সাথে হাসি-তামাশা করতো। তাদের নিকট দিয়ে যাবার সময় চোখের ইশারায় বিদ্রুপ করতো। নিজের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়ে তাদের সমালোচনায় মুখর হতো। আর মুসলমানদের দেখা মাত্র বলে উঠতো, এরাই তো পথভ্রষ্ট। অথচ মুসলমানদের উপর তাদেরকে রাখাল বানিয়ে পাঠানো হয়নি। আজ (আখেরাতের দিনে) মুসলমান কাফেরদের দেখে হাসবে এবং নিজেদের গদিতে বসে তাদের দিকে তাকাবে। কাফেররা আজ তাদের কৃতকর্মের কেমন ফল লাভ করল।''- আল মুতাফিফফীনঃ ২৯-৩৬

পবিত্র কুরআনে মু'মিনদের প্রতি কাফেরদের বিদ্রূপের উক্তিও নকল করে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেঃ

‘‘তাদেরকে যখন আমাদের আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে শুনানো হয়, তখন কাফেররা মু’মিনদের লক্ষ্য করে বলে, বল, আমাদের দু’পক্ষের মধ্যে কার অবস্থা ভাল, আর কোন্ পক্ষেও মজলিস জাক-জমকপূর্ণ ?’’

অর্থাৎ দু’পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ উত্তম ? যেসব গোত্রপতি, সামাজিক নেতা ও ধনী ব্যক্তিগণ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি তারা এক পক্ষ এবং যেসব দরিদ্র ও অসহায় লোক ঈমান আনয়ন করেছিলেন, তারা অপর পক্ষে। দু’পক্ষের মধ্যে কে উত্তম, তা-ই ছিল তাদের প্রশ্ন। নসর বিন হারেস, ওমর বিন হিশাম, ওলীদ বিন মুগীরা ও আবু সুফিয়ান বিন হারব ছিল সমাজের প্রতিষ্টিত নেতা ও মুরুব্বী। পক্ষান্তরে হযরত বিলাল, হযরত আম্মার, হযরত খাববাব (রাঃ) প্রমুখ ব্যক্তিগণ ছিলেন সহায়-সম্বলহীন। কাফেররা বলাবলি করতো, যদি মুহাম্মাদ (সাঃ) সত্য সত্যই আল্লাহর নবী হতেন তাহলে কুরাইশ গোত্রের এসব নিম্নস্তরের লোক তাঁর দলে যোগদান করবে কেন ? এদের চেয়ে অধিকতর মর্যাদাশীল ব্যক্তি কি সমাজে ছিল না? তাদের নিজেদের একত্রে সমবেত হওয়ার জন্যে একটি সাধারণ মানুষের বাড়ী (হযরত ইশরামার বাড়ী) ছাড়া, ভাল স্থানও তো নেই। ওদিকে ইসলাম বিরোধী দলতো আন-নাদওয়ার মত প্রশস্ত মিলনকেন্দ্রের অধিপতি। তাদের আছে শান-শওকত, আছে প্রাচুর্য এবং জাতির নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা।

পার্থিব স্বার্থপূজারীদের দৃষ্টিভংগীই এরূপ। সকল কালে ও সকল যুগে দুনিয়ার সর্বত্র তাদের সৃষ্টি সর্বদাই নিম্নমুখী রয়েছে। উচ্চ দিগন্তের দিকে তারা কখনো তাকিয়ে দেখেনি।

মু’মিন তার মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা ও গ্রহণ বর্জনের মানদন্ড নিরূপনের জন্যে কোন মানুষের মুখাপেক্ষী নয়। সে তো সব বিষয়ই বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহর নিকট থেকে গ্রহণ করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত মানদন্ডই তার জন্যে যথেষ্ট। সে মানুষের মর্জীর উপর নির্ভরশীল নয়। সে জন্যে মানুষের মর্জী পরিবর্তনের সাথে সাথে তার মতামত পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। কারণ, মু’মিন সহাসত্যের উপর ঈমান আনয়ন করেছে। সত্য অটল ও অপরিবর্তনীয় এবং কখনো তা দোদুল্যমান থাকে না। সীমাবদ্ধ ও অস্থায়ী পৃথিবী থেকে মু’মিন কোন প্রেরণাই গ্রহণ করে না। তাঁর সকল প্রেরণার উৎস হচ্ছে বিশার সৃষ্টির স্রষ্টা, পরিচালক ও প্রতিপালক। তাই মু’মিনের হৃদয় দুর্বল হতে পারে না। যে কখনো নৈরাশ্যের শিকার হয় না। মানুষের প্রতিপালক, সত্যের মহান উৎস ও সকল শক্তির মূল কেন্দ্রের সাথে সংযুক্তির পর ভয়-ভীতি ও আশংকার কোন কারণ থাকতে পারে কি ?

মু’মিন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য থেকে বিচ্যুত হলে বাতিল বা মিথ্যা ছাড়া কিছুই হাসিল হবে না। বাতিলের ঢাক-ঢোল থাকে থাকুক, তার চারদিকে জনতার ভিড় লেগে থাকে থাকুক; সত্য সে জন্যে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে না। হক বা সত্য পথ ছেড়ে বাতিলের সাথে কখনো কোন আপোষ করবে না। তার নিকট থেকে এরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র।

‘‘হে রব! হেদায়াতের পথ দেখানোর পর আমাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি হতে দিও না। আর তোমার রহমাতের ভান্ডার থেকে আমাদের প্রতি রহমাত বর্ষণ কর। নিশ্চয়ই তুমি উদার ও দাতা। পরওয়ারদিগার! একদিন তুমি অবশ্যই সকল মানুষকে একত্রে সমবেত করবে। আর সে দিনের আগমন সম্পর্কে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই। আল্লাহ তা’আলা কখনো তার ওয়াদা লংঘন করেন না।’’ - আলে ইমরানঃ ৮-৯